হরিহর নন্দীর নাট্যকর্ম

মহীবুল আজিজ[*]

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকাকালে ঘটনাচক্রে আমি সাতটি নাট্যকর্মের সন্ধান পাই। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি প্রহসন এবং দুটি নাটক। নাট্যকর্মগুলোর রচনাকাল ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ। সবগুলোই তৎকালীন ভারতবর্ষের বাংলা প্রদেশের পূর্বাঞ্চল তথা ঢাকা জেলা থেকে প্রকাশিত। ইতঃপূর্বে হরিহর নন্দীর আর কোনো নাটক কিংবা প্রহসনের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায়নি। তাই আমার ধারণা ছিল, ইনি মূলত ঢাকানিবাসী এমন একজন শক্তিশালী নাট্যকার ছিলেন যাঁর রচনা সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে এবং যাঁর সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকারেরাও তেমন কোনো আলোচনা বা উল্লেখ করেননি।

কিন্তু বিশিষ্ট গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের (১৯৪৬-২০২১) *হরিশচন্দ্র মিত্র : ঢাকার সাহিত্য* ও সাময়িকপত্র (১৯৯০) গ্রন্থটি পাঠ করে আমি খানিকটা সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ি। ঢাকা জেলা নিবাসী হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পর্কে তিনি যে-গ্রন্থটি লিখেছেন সেটি নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ গ্রন্থ। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্মৃতপ্রায় একজন শক্তিশালী রচয়িতাকে তিনি ফিরিয়ে এনেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান ইতিহাসকার-গবেষক সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২)) এবং গবেষক গোলাম মুরশিদ (জন্ম ১৯৪০) উভয়েই প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া সৈয়দ আবুল মকসুদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সাহিত্যসাধক চরিতমালায়* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার দুজন নামকরা সাহিত্যিক হরিশচন্দ্র মিত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই গ্রন্থটির মাধ্যমে হরিশচন্দ্র মিত্রের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না।

সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর গ্রন্থটিতে হরিশচন্দ্র মিত্রের জীবন ও কর্মের যে-মূল্যায়ন করেন এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান বিষয়ে যে-দাবি উত্থাপন করেন তা যথার্থ।

---

[*]অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

তাঁর গ্রন্থটি অবলম্বনে হরিশচন্দ্র মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা যেতে পারে। হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৬-১৮৭২) ছিলেন কবি, সমালোচক, নাট্যকার, গীতিকার, ছোটগল্পকার, শিশুসাহিত্যিক, পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা, সাংবাদিক, সাহিত্য ও সাময়িক-পত্রের সম্পাদক ও প্রকাশক। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি ঢাকা থেকে *কবিতাকুসুমাবলী* নামে যে-কবিতাপত্রিকা প্রকাশ করেন সেটিই ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার প্রথম কবিতাপত্রিকা। সৈয়দ আবুল মকসুদের মতে হরিশচন্দ্র মিত্রের চাইতেও অনেক কম প্রতিভাবান কবি বাংলাদেশের সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন, কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে[১] সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর থেকে প্রথমত পাকিস্তানি ভাবধারার প্রতাপে এবং পরবর্তীকালে উত্তরপ্রজন্মের বিস্মৃতিপ্রবণতার শিকার হয়ে তিনি হারিয়ে যান অপসৃয়মানতায়। অথচ ১৮৭২ সালের ১১ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হলে বিখ্যাত *অমৃতবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মৃত্যুসংবাদ এবং বলা হয়, হরিশচন্দ্র মিত্র "ঢাকা প্রদেশের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন"। ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে হরিশচন্দ্র মিত্র, হরিহর নন্দী এবং আরও অনেকের বিভিন্ন শ্রেণির যেসব রচনা সংরক্ষিত রয়েছে তা থেকে সেই সময়কার ঢাকা নগরীর একটি চমৎকার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় মেলে। সেসব রচনার মুদ্রণালয়গুলোর নাম, ঠিকানা ও পরিচিতি ('বাঙ্গলা যন্ত্র', 'নতুন যন্ত্র', 'সুলভ যন্ত্র', 'গিরিশ যন্ত্র', ও অন্যান্য) থেকে বলা যায় যে অন্তত ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দশকটি কলকাতায় যেমন ঘটনাবহুল ও তরঙ্গপূর্ণ ছিল তেমনি তারই সমান্তরালে ঢাকার উল্লেখযোগ্যতাও বিদ্যমান ছিল প্রায় সমপরিমাণে। আবার, ১৮৬৫ সালে ঢাকায় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দশকটি যে আরও স্রোতোস্বর হয়ে উঠতে থাকে সেটি জানা যায় মুনতাসীর মামুনের *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার* (১৯৭৯) গ্রন্থ থেকে। সৈয়দ আবুল মকসুদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে দেখতে পাওয়া যায়, ১৮৬০ সালে ঢাকার 'বাঙ্গলা যন্ত্র' থেকে দীনবন্ধু মিত্রের *নীল-দর্পণ* নাটকের যে-প্রথম সংস্করণ বেরোয় সেটির কম্পোজিটর ছিলেন হরিশচন্দ্র মিত্র। পরবর্তীকালে সে-চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজেই অংশীদারিত্বে ছাপাখানার ব্যবসায় ও পত্রিকা সম্পাদনায় নিয়োজিত হন। বস্তুত এই পুরো দশক জুড়ে (১৮৬০-১৮৭০) এবং তারও পরে প্রথমত হরিশচন্দ্র মিত্র এবং দ্বিতীয়ত হরিহর নন্দীর সাহিত্যিক তৎপরতা ছিল স্মরণীয়।

ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত হরিহর নন্দী ও হরিশচন্দ্র মিত্রের রচনাবলি থেকে এই দুজন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব, কিন্তু নাট্যকার হরিহর নন্দীকে নিয়ে যে-ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে সেটির মূলোৎপাটন আশু করণীয়। এই বিভ্রান্তির মূলে প্রথমত সুকুমার সেন এবং দ্বিতীয়ত সৈয়দ আবুল মকসুদ। সুকুমার সেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন হরিহর নন্দী রচিত সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এবং সৈয়দ আবুল মকসুদ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন তাঁর পরিচিতি

সম্পর্কে। সৈয়দ আবুল মকসুদের ধারণা, হরিশচন্দ্র মিত্র এবং হরিহর নন্দী একই ব্যক্তি। তাছাড়া, হরিশচন্দ্র মিত্রের একাধিক ছদ্মনামেরও উল্লেখ করেছেন তিনি – যেমন, ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল, হরিহর নন্দী ও শ্রীমতী নিতম্বিনী। তিনি নিশ্চয়তার সঙ্গে লিখেছেন :

> শ্রী হরিহর নন্দী কলম-নামে হরিশচন্দ্র লিখেছিলেন এবং তাঁর গিরিশ যন্ত্র ছাপাখানা থেকে প্রকাশ করেছিলেন আরো চারটি নাটক-প্রহসন – কলির বৌ ঘর ভাঙ্গনী নাটক, ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম প্রহসন, হঠাৎ বাবু প্রহসন এবং নাতিন জামাই প্রহসন। (সৈয়দ, ১৯৯০ : ৭২)

বস্তুত নাটক/প্রহসনগুলো হরিহর নন্দীরই লেখা এবং ইনি হরিশচন্দ্র মিত্র নন। হরিশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হয় ১৮৭২ সালে। আর হরিহর নন্দীর প্রথম নাটক *কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী* প্রকাশ পায় ১৮৭৬ সালে এবং পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আবুল মকসুদের দেওয়া তথ্যানুসারে হরিশচন্দ্রের জন্ম হয় ঢাকার বাবুবাজার অঞ্চলে। তাঁর পিতা অভয়াচরণ মিত্র মূলত হাওড়ার অধিবাসী ছিলেন। শোভাবাজার-রাজপরিবারের ঢাকাস্থ কর্মচারী হিসেবে তাঁকে ঢাকায় আসতে হয়, এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। অন্যদিকে, হরিহর নন্দী ছিলেন ঢাকা জেলার 'শাক্তা' গ্রামনিবাসী। তাঁর নাটক কিংবা প্রহসনের শেষ প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম শ্রী হরিহর নন্দীর সঙ্গে 'সাং শাক্তা' কথাটা সংযুক্ত থাকতো। আসলে হরিশচন্দ্র মিত্র বিচিত্র ধরনের লেখা, বিশেষ করে কাব্য রচনায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করবার ফলে সমকালে এবং সমকাল ছাড়িয়েও অনেকটা কাল খ্যাতিমান ছিলেন এবং একজন সব্যসাচী লেখক হিসেবে তাঁর সেই খ্যাতির ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন অন্য অনেকেই। হরিশচন্দ্র মিত্রের কাব্যপ্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ ১৮৬১ সালে *কবিতাকুসুমাবলী*তে প্রকাশিত 'পরিচ্ছদের গর্ব্ব' নামক যে-কবিতাটির উদ্ধৃতি সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন সেটি অল্প কিছুদিন পূর্বেও স্কুলের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত 'সারমর্ম'-শ্রেণির নির্ধারিত পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কবিতাটির বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ের উদ্ধৃতি :

> মহামূল্য পরিচ্ছদ, রতন ভূষণ,
> নরের মহত্ব নারে করিতে বর্দ্ধন!
> জ্ঞান-পরিচ্ছদ, আর ধর্ম্ম-অলংকার,
> করে মাত্র মানুষের মহত্ব বিস্তার! (সৈয়দ, ১৯৯০ : ৫৬)

হরিশচন্দ্রের এরকম বেশকিছু কাব্যপঙ্‌ক্তি বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাসকার সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন :

> "মুন্‌শী নামদার" সম্ভবত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। ইঁহার পুস্তিকা – 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৭), 'কলির বৌ হাড়জ্বালানী' (১৮৬৮), 'কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী' (১৮৭৯), 'ননদভাজের ঝগড়া' (১৮৬৯), 'ভ্যালারে মোর বাপ' (১৮৭৬) ইত্যাদি। (বছর দশেক পরে ঢাকার হরিহর নন্দী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনাগুলি নিজনামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।) (সুকুমার, ১৪০১ : ১৪১)

সুকুমার সেন স্পষ্টত হরিহর নন্দীকে অভিযুক্ত করেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনাকে নিজের নামে চালিয়ে দেবার জন্যে, যেটিকে এক অর্থে বলা চলে চৌর্যবৃত্তি। কিন্তু সত্যই হরিহর নন্দী এমন কাজ করেছিলেন কিনা সে-বিষয়ে সুকুমার সেন তাঁর কৃত মন্তব্যটির সপক্ষে কোনো প্রমাণ সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেননি। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা ও সুকৃতি সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিখ্যাত অভিনেতা-নাট্যকার-পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) স্নেহধন্য ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র কর্মজীবন অতিবাহিত হয় কলকাতায়। আমরা ইতিহাস থেকে জানি গিরিশ ঘোষ ১৮৭২ সালে কলকাতায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, স্টার থিয়েটার প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত তাঁর নাম। বিখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফীও অভিনয় করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। নাট্যরচয়িতা ও অভিনেতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগত প্রশংসা করেন সুকুমার সেন। বিশেষ করে কলকাতায় মনোমোহন বসু এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রমুখের অভিনয়শিল্পের প্রশংসা রয়েছে তাঁর গ্রন্থে। কিন্তু ভোলানাথ যেখানে কলকাতাবাসী, সেখানে হরিহর নন্দী ঢাকাবাসী। সুকুমার সেন সেটা বলেছেনও। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হরিহর নন্দী কেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা নিজের বলে চালিয়ে দেবেন। ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে হরিহর নন্দীর নাটক/প্রহসন প্রভৃতির যে-সংস্করণ আমরা পাই সেগুলোতে স্পষ্টভাবেই হরিহর নন্দীর নামই মুদ্রিত রয়েছে। তাছাড়া ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মূলত পৌরাণিক বিষয়াদির আশ্রয়ে তাঁর নাটক/প্রহসনগুলি লিখেছিলেন। তবে তাঁর রচিত *কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে* (১৮৬৩) নাটকটি সামাজিক বিষয়বস্তু-নির্ভর নাটক। আমাদের ধারণা, সুকুমার সেন কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যে ও নাট্যচর্চার ওপর অধিক জোর প্রয়োগ করতে গিয়ে একই সময়কার ঢাকাবাসী কবি-লেখকদের সাহিত্যকর্মকে খানিকটা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছেন। অথচ হরিশচন্দ্র মিত্র এবং হরিহর নন্দী এই দুজন মৌলিক চরিত্রসম্পন্ন লেখককে কোনোভাবেই গৌণ লেখক বলা চলে না। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সাল, উনিশ শতকের এই দশকটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে কলকাতায় খুবই ঘটনাবহুল ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু পাশাপাশি ঢাকার উল্লেখযোগ্যতাও ছিল অনস্বীকার্য। ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত নাটক/প্রহসনের রচয়িতা হরিহর নন্দীর

রচনাবলি তাঁর নিজেরই লেখা। সৈয়দ আবুল মকসুদ হরিহর নন্দীর মূল রচনা দেখে থাকলে তাঁকে হরিশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেন না। আর, সুকুমার সেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে নাটক/প্রহসন রচয়িতা হরিহর নন্দীর অবদানকে খাটো করে ফেলেছেন। শুধু তা-ই নয়, বিনা প্রমাণে তিনি হরিহর নন্দীকে যে-কাজের (সাহিত্যিক চৌর্যবৃত্তি) দায়ে অভিযুক্ত করেন সেটিকে একই সঙ্গে অপবাদ এবং অপমানও বলা চলে। অথচ আপন সৃষ্টিকর্মের গুণে খ্যাত হরিহর নন্দী কোনোভাবেই এসব অপবাদ-অপমানের দায়ভারের উপযুক্ত ছিলেন না। *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* গ্রন্থে গবেষক গোলাম মুরশিদ (১৯৮৪) জানান, তিনি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের *কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে* নাটকটি স্বচক্ষে দেখেননি, তবে তিনি তাঁর *ভ্যালারে মোর বাপ* নামক প্রহসনটির পাঠ-অভিজ্ঞতাকে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। সুকুমার সেনের কথা অনুসারে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের এতগুলো নাটক/প্রহসন যদি হরিহর নন্দী আত্মসাৎ করতেন তাহলে সেটি নাট্য-গবেষক মুরশিদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না, যেখানে তিনি তাঁর গ্রন্থটিতে বহুসংখ্যক নাট্যকারের বিপুল পরিমাণ নাটক ও প্রহসনের উল্লেখ করেছেন। কাজেই, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত হরিহর নন্দীর নাটক/প্রহসনগুলো তাঁরই রচনা, এমন ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করে আমরা তাঁর নাটক/প্রহসন সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রসর হবো।

হরিহর নন্দী রচিত সর্বমোট সাতটি নাটক/প্রহসন ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। তবে তাঁর *লোভ পাপ পাপে মৃত্যু*, *ঘোড়ার ডিম*, *বিধবা বিবাহ নাটক* প্রভৃতি নাট্যকর্ম অনেক খোঁজ করেও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাওয়া যায়নি। তাঁর অন্যান্য বইয়ে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন থেকে এগুলো সম্পর্কে জানা যায়। প্রকাশকালের অনুক্রমে হরিহর নন্দীর নাটক/প্রহসনগুলো – (১) *কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী* (নাটক, প্রকাশকাল ১৮৭৬ সালের ৫ এপ্রিল) (২) *ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম* (প্রহসন, প্রকাশকাল ১২৮৩ সনের ২৮ চৈত্র) (৩) *হঠাৎবাবু* (প্রহসন, প্রকাশকাল ১৮৭৮ সালের ২৩ জুলাই) (৪) *নাতিনজামাই* (প্রহসন, প্রকাশকাল ১৮৭৮ সালের ৮ আগস্ট) (৫) *ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি* (প্রহসন, ১৮৭৯ সালের ২০ ডিসেম্বর) (৬) *ননদ ভাই বৌর ঝগড়া* (নাটক, ১৮৮০ সালের ১ মার্চ) (৭) *কলির কুলাঙ্গার* (প্রহসন, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ)। উপর্যুক্ত নাটক এবং প্রহসনগুলোর শিরোনাম থেকে বোঝা যায়, এসব হাস্যব্যঙ্গাত্মক ভাবপ্রধান এবং এগুলোয় পারিবারিক-সামাজিক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকবে। বস্তুত সূচনালগ্ন থেকে বাংলা নাটকের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সামাজিক সংলগ্নতার ধারা একটা বড় ভূমিকা পালন করে। বলা যায়, উনিশ শতকের সামাজিক বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছিল সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম নাটক। প্রচুর বাংলা নাটকের উল্লেখ করা যায় যেগুলো বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা, জটিলতা, সংকট এসবকে সাফল্যের সঙ্গে প্রথমত মঞ্চের

আঙিনায় এবং দ্বিতীয়ত বইয়ের পরিসীমায় উৎকীর্ণ করে রেখেছিল। ইতিহাসের পরিক্রমায় সাহিত্যজগতে সেসব নাটক এবং প্রহসনের অবস্থান আজও ইতিবাচক বলেই স্বীকৃত। বাংলা নাটক ও প্রহসনের প্রসঙ্গে বলা যায়, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বেশকিছু সামাজিক প্রেক্ষাপট বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যেমন, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, নারীমুক্তি, পানাসক্তি, লাম্পট্য, বেশ্যাগমন ইত্যাদি। হরিহর নন্দীর জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর নাট্যসাধনার মূল কালপরিধি ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত বিবেচনা করলে এবং তাঁকে হরিশচন্দ্র মিত্রের খানিকটা বয়ঃকনিষ্ঠ ধরলে তাঁর আনুমানিক জন্ম-মৃত্যুর সাল দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৪০ এবং ১৮৮৫ সাল। সে-হিসেবে প্রথম নাটক প্রকাশকালে হরিহর নন্দীর বয়স ৩৬ এবং সর্বশেষ (এ-যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যানুসারে) নাটক রচনাকালে তাঁর বয়স ৪০ বছর। এই আনুমানিক বিবেচনাটি সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবস্থানটিকে চিহ্নিত করবার জন্যে। সেক্ষেত্রে নাটক-প্রহসন রচয়িতা হরিহর নন্দীর গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরি হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, হরিশচন্দ্র মিত্রকে। এঁরা ছাড়াও ছিলেন অপ্রধান অনেক নাট্যরচয়িতা। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় বসে যখন হরিহর নন্দী তাঁর নাটক-প্রহসন ইত্যাদি রচনা করছিলেন তখন একই সমান্তরালে রাজধানী কলকাতাতেও চলমান ছিল বাংলা নাটকের মঞ্চীয় ও সাহিত্যিক বিকাশের প্রবহমানতা। কাজেই বাংলা নাটকে নাট্যিক অবদান-সৃষ্টিকারী হরিহর নন্দী বাংলা নাটক ও প্রহসনের মূল যাত্রাপথের সারথি হিসেবেই বিবেচ্য।

ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত এবং এযাবৎকাল অনাবিষ্কৃত বেশকিছু নাট্যিক নিদর্শনের অধিকারী হরিহর নন্দীর নাটক ও প্রহসনগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। *কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী* তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রচ্ছদ-পরিচিতি অনুযায়ী এটি একটি নাটক, মুদ্রিত হয় ঢাকা গিরিশযন্ত্রে। এর প্রকাশক শ্রীমুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার। প্রকাশকাল: 'সন ১৮৭৬। ৫ই এপ্রিল।' নাটিকাটির মূল্য: 'দশ আনা মাত্র'। শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের উদ্ধৃতি :

> এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ ঢাকাস্থ সমুদয় পুস্তকালয়ে, কলাতিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রজনীনাথ চাক্‌লাদার মহাশয়ের নিকট, শাক্তা গ্রামে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার শর্ম্মার নিকট, ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। শ্রী হরিহর নন্দী সাং শাক্তা।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪, এছাড়া বাকি ৪ পৃষ্ঠা প্রচ্ছদ এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনের জন্যে বরাদ্দ। হরিহর নন্দীর এ-নাটক এবং অন্যান্য নাটক ও প্রহসনকে নাটিকা বলাই অধিকতর সংগত, কেননা সবগুলোতেই অঙ্কসংখ্যা কম। প্রতিটি নাট্যকর্ম ন্যূনপক্ষে তিন এবং অধিকপক্ষে পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট। তাছাড়া নাটিকাগুলো প্রায়শ একাধিক গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত।

কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী তিনটি গর্ভাঙ্কবিশিষ্ট একাঙ্ক নাটিকা। নাটকের চরিত্রগুলো হলো যোগেশচন্দ্র দাস, মাধব দাস, ধনা, শুভঙ্কর দাস, মেঘমালা, নীলাম্বর মুন্সি। চরিত্রগুলোর মধ্যে নীলাম্বর মুন্সি জমিদার এবং অন্য সকলেই সাধারণ প্রজা যারা মূলত কৃষকস্থানীয়। প্রথমাঙ্কের সূচনা ঘটে যোগেশচন্দ্র দাসের বাড়িতে এবং ঘটনাসূত্রে জানা যায়, মাধব দাস যোগেশচন্দ্র দাসের খোঁজে বেরিয়ে জানতে পারলো সে বাড়ি নেই, গেছে ঘোষালদের বাড়ি। সেখানে 'আন্ধাপুকুর নারা' দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ পুকুর সেঁচে মাছ ধরা চলছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল শুভঙ্কর দাসের বাড়ি। শুভঙ্করের স্ত্রী মেঘমালা উপবিষ্ট। মাধব দাসও সেখানে উপস্থিত। মাধব মেঘমালার কাছে 'জলপান' চাইলে সে তাকে চারটা 'মৌল্কা' দেয়। মাধব মুড়ি ও গুড় চাইলে মেঘ জানায় যে, সেসব পূর্বরাত্রিতে একটা কুকুর ও একটা বিড়াল পরামর্শ করে খেয়ে ফেলেছে। তখন মাধব বলে যে 'দাদা' চাইলে ঠিকই 'কলস হতে মুড়ি, গুড়, বাতাসা' বেরিয়ে আসবে। এতে করে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। মেঘ 'জ্বালকাঠি' নিয়ে মাধবকে প্রহারোদ্যত হলে সে দৌড়ে গিয়ে নালিশ জানায় জমিদার 'নীলেম্বরের' নিকটে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল জমিদার নীলাম্বর মুন্সির বাড়ি। সেখানে উপস্থিত মাধব, জমিদার আসীন এবং তাঁর হাতে পান। মাধব জমিদারকে মেঘ সম্পর্কে নালিশ জানায়। মেঘমালা যে বিভিন্ন সময়ে তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে সে-সম্পর্কে সে বিশদ জানায় জমিদারকে। মাধবের মতে, তাদের যেটুকু পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে তাতে তারা দুই ভাই সম-অংশীদার। শুনে জমিদার তাকে জানায়, সে শুভঙ্করের (মাধবের ভাই) সঙ্গে কথা বলে তাকে জানাবে। প্রস্থানোদ্যত মাধবকে দয়াল ঘোষ (সম্ভবত জমিদারের কর্মচারি) জানায়, নিজেদের ঘরের ব্যাপার জমিদারকে জানানোটা তার অনুচিত হয়েছে। তখন মাধবের উত্তর, ভাইয়ের বৌ যখন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, সেটা কী বিবেচনাযোগ্য! মাধবের প্রস্থানের পর সেখানে 'খরম পায় পাখা হস্তে গুণ২ স্বরে গান করিতে২ শুভঙ্করের প্রবেশ' ঘটে। জমিদার শুভঙ্করের নিকট থেকে মাধবের অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে শুভঙ্কর জানায়, মাধব এবং তার ভাইয়ের বৌয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল পান্তাভাত-খাওয়া নিয়ে। মাধবের দোষ ছিল খানিকটা, যেজন্যে মেঘমালা তাকে 'ঠোকর' মারে। তখন জমিদার শুভঙ্করকে পাল্টা জিজ্ঞেস করে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও কেন সে মেঘমালার আচরণের প্রতিবাদ করেনি। শুভঙ্কর বললো, সে নিজেও তার স্ত্রীর ভয়ে ভীত, তাই সে নীরব থাকে। জমিদার মেঘমালাকে দোষী সাব্যস্ত করে তার 'এক আনা' জরিমানা নির্ধারণ করে দেন। জমিদারের জরিমানা পরিশোধ করে শুভঙ্কর বাড়ি ফেরে এবং স্ত্রী মেঘমালাকে কঠিন স্বরে জানায়, সে যেন মাধবকে বাড়িতে জায়গা না দেয়। কারণ, তারই খেয়ে তারই নামে সে নালিশ করতে গেছে জমিদারের কাছে। মাধব বাড়ি ফিরে এলে মেঘমালা তাকে ঝাড়ু-হাতে আচমকা মারতে শুরু করলে মাধব সেখান থেকে দৌড়ে

পালিয়ে যায় পুনরায় জমিদারের নিকটেই। আর্তস্বরে জমিদারকে জানায়, শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃবধূর ঝাড়ুর 'বাড়ি'ই লেখা ছিল তার ললাটে। দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে সে বলে, বাড়ি নয় এখন সে গিয়ে আশ্রয় নেবে 'মিছারাম দাসের আক্রা'য়। গান গাইতে গাইতে প্রস্থান ঘটে মাধবের এবং নাটিকার এখানেই পরিসমাপ্তি।

মূলত পারিবারিক পটভূমিতে লেখা হলেও হরিহর নন্দীর *কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী*তে সেই সময়কার বাংলার সামাজিক চিত্রের প্রতিফলন অনস্বীকার্য। পূর্ববঙ্গের অতি দরিদ্র কৃষক পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত নাটিকাটির কাহিনি-বৃত্ত পারিবারিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। নাটিকার শিরোনাম থেকেই পারিবারিক কলহের বিষয়টি পরিস্ফুট এবং তাতে পরিবারের বধূ-চরিত্রের ওপর চাপানো হয় দায়। দেখা যাচ্ছে, মাধব এবং শুভঙ্কর দুই ভাইয়ের মধ্যকার দূরত্ব, দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের জন্যে দায়ী সংসারে বধূ হয়ে আসা নারী মেঘমালা। নাটিকায় তাকে 'ঘরভাঙ্গনী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত সামাজিক পুরুষদৃষ্টিতে নারীর অবস্থানটিও এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। হরিহর নন্দীর এ-নাটিকাটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ১৩/১৪ বছর এবং তখনও তিনি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'শাস্তি' রচনা করেননি। সে-গল্পেও পূর্ববঙ্গের গ্রামের একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারের দুই ভাই (ছিদাম এবং দুখিরাম) এবং ভ্রাতৃবধূ চন্দরাকে নিয়ে রচিত হয় কাহিনি। হরিহর নন্দীর নাটকে পরিস্থিতি-অনুগ সংলাপ লক্ষণীয়। সংলাপগুলিতে কৃষক-পরিবারের বাস্তব ভাষিকতার প্রয়োগ ঘটেছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা শহরের সাধারণ মানুষের কথকতা, বাগ্‌ভঙ্গি এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক এসব সংলাপে মূর্ত। ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতি মাধবের সংলাপটি লক্ষ করা যাক, যেখানে একেবারে নিত্যদিনের গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তবতার চিত্রণ পাওয়া যাচ্ছে –

> মাধব। বৌ ঠাক্‌রুণ! আমাকে চারিটা জলপান দিন্ দেখি, আজি ঘোষালদের বাড়ীর বড় আন্ধাপুকুর নারা দিয়াছে যদি গুটি ৫/৬ কৈ পাই তবে বিকেলকার কর্ম্ম হইবে, ডাইল খাইতে২ আর ভাল লাগে না, প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ ডাইল খাইতেছি। (২য় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ২)

সনাতন বাঙালি পরিবারে-সমাজে দেবর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যকার মধুর সম্পর্কের কথাই সকলের জানা, কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে সেই সম্পর্কটাই হয়ে উঠতে পারে ভয়ানক বৈরী। দেবর মাধব এবং ভ্রাতৃবধূ মেঘমালার মধ্যকার সংলাপে সেটি প্রতিবিম্বিত–

> মাধব। শোন বৌ, তুমি এত লম্বা২ কথা বলো না মুখ সামলাইয়া কথা বল; দাদা আমার সহোদর ভাই; তুমি পরের ঝি উড়ে এসে পুড়ে খাচ্চ – আমাদের সোনার সংসার মাটি কল্লে।

মেঘ। কি! এত বড় কথা, আমার স্বামী রোজগার করে দেয়, আর বাড়ি বসে খেয়ে২ সারা তেল হয়েছে, আয় তোর তেল মজিয়ে দেই। (এই বলিয়া জ্বালকাঠি লইয়া মারিতে উদ্যত)। (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ৪)

জমিদার নীলাম্বর এবং মাধবের সংলাপে একই সঙ্গে জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণা ও কৌতুককর পরিস্থিতির সাক্ষাৎ মেলে –

নিলেম্বর। তবেত বৌ দেখি বড় গিপ্তাইন। ভাল, এহাতে শুভঙ্কর কিছু বলে না?

মাধব। তাহইলে আর এমন হবে কেন?

নিলেম্বর। তোমাদের পিতার সম্পত্তি কি কি আছে?

মাধব। আজ্ঞা একটি আবাল আর একটি বকুন বাছুর আর দাদাকে যে বিবাহ করাইয়াছে।

নিলে। সেই বিবাহের সরিক কি তুই রে?

মাধব। আইগা সে কথা বলি না, দাদাকে যে টাকা ব্যয় কইরে বিবাহ করায়েছেন, সেই টাকার সরিকের কথা বলছি। (তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ৮-৯)

জমিদারের কাছে নালিশ পেশ করে বাড়ি-ফেরা মাধবকে লক্ষ করে মেঘমালার তীব্র-ঝাঁঝালো সংলাপ যেটি নাটকের অন্তিমে ব্যবহৃত হয় উপসংহৃতির অভিমুখে :

মেঃ। ছোটঠাকুরপো। তুমি পিছা শলা না খাইতে সকালে বাড়ী হতে বেরো, তিন বেলা তিন পাথর পানারা খেয়ে২ শরীর দিয়া যেন লুন্দি পড়েছে। যার কাছে নালিশ করিয়াছ তার কাছে যাও, সেই তোমাকে খেতে দিবে। (তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১৩)

নাটকটি শেষ হয় মাধবের স-গীত গৃহপ্রস্থানের মধ্য দিয়ে। গানের উদ্ধৃতি :

তাল আড়াখেম্‌টা।
ভেক নেব আর রব না ঘরে।
ভাউজ হ'য়ে মন্দকথা কয়,
দেবর হয়ে আর কত জ্বালা সয়,
কাল সকালে ভেক নেব
যাব মিছারামের মন্দিরে ।। (তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১৪)

কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী নাটিকায় মেঘমালা চরিত্রটিকে ভিলেন হিসেবে রূপায়িত করা হয়েছে এবং একটি সাজানো সংসারে কলহ-বিসংবাদের কারণ হিসেবে চিত্রিত চরিত্রটি। বস্তুত নাটিকায় সবচাইতে প্রাধান্য বিস্তারকারী বিষয় হলো নেপথ্যের দারিদ্র্য। প্রজাসাধারণ এবং প্রভাবশালী জমিদারদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যায় নাটিকাটি থেকে। হরিহর নন্দীর নাটিকার চরিত্রগুলোর সংলাপ অত্যন্ত জীবন্ত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে, সেই সময়টাতে লোকে সাধু ও চলিত ভাষার মিশেলে কথা বলতো কিনা সেটা গবেষণাসাপেক্ষ তবে নাটিকার সংলাপে উভয়

রীতির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। নাটিকার লোকোভাষাশ্রিত শিরোনামে হাস্যব্যঙ্গের আভাস থাকলেও এটির সামাজিক বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ।

হরিহর নন্দী রচিত প্রথম প্রহসন *ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম*। প্রচ্ছদে মুদ্রিত তথ্যানুযায়ী এটির প্রকাশক শ্রী মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সনের ২৮ চৈত্র (অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ১৮৭৬ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি)। সে-হিসেবে প্রকাশের কালানুক্রমে এটি তাঁর দ্বিতীয় সাহিত্যকর্ম। শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য :

> এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ, ঢাকা পাটুয়াটুলী ২৩নং ভবনে শ্রীযুক্ত কালিচরণ দে মহাশয়ের নিকট ও শ্রী রামচরণ নাথের দোকানে, ধাত্রী ফুলমণি দাসীর বাসায়, এবং শাক্তা গ্রামে শ্রী কৃষ্ণকান্ত দে তাঁহার নিকট, ঢাকা গিরিশযন্ত্রে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি সন ১২৮৩ ২৮ চৈত্র। শ্রী হরিহর নন্দী সাং শাক্তা।

প্রচ্ছদ ও তথ্য-বিজ্ঞাপনের জন্যে বরাদ্দ চার পৃষ্ঠা বাদ দিলে এটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯। তিন অঙ্কে রচিত প্রহসনটির প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থল গোপাল বাবুর বৈঠকখানা। এতে চরিত্রসংখ্যা তিন – গোপাল, রামকান্ত এবং দামা। মাস ফুরোতে আরও দশ দিন বাকি অথচ গোপাল বাবুর হাতে একটি পয়সাও নেই। তাই সে খুব চিন্তাগ্রস্ত। তারও একই দশা। বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, ছোট ছেলের অন্নারম্ভ, বড় বৌয়ের ব্রত প্রতিষ্ঠা। চাকুরিস্থলে কাউকে বিকল্প রেখেও যাওয়ার উপায় নেই। তখনই মনে আসে রসিকবাবুর কথা। রসিকবাবুর চাকুরি গেছে সম্প্রতি। তার বেতন ১২ টাকা কিন্তু সে চলতে চায় বাবুর মতোন। এই নিয়ে দুজনে সমালোচনা করতে করতে রসিকবাবুর বাড়ির দিকে চললো। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল রসিকবাবুর বাড়ির বাহির-আঙিনা। এতে চরিত্রসংখ্যা ৫ – রসিক, রামকান্ত, গোপাল, ঝাঞ্জু এবং রসকরা আলী। পত্রিকায় পহেলা বৈশাখ শাক্তাগ্রামে দিগম্বরী মেলার বিজ্ঞাপন দেখে তিনজনে আলাপ করছিল মেলায় যাওয়ার বিষয়ে। এমন সময় রসিকের বাড়িতে আগমন ঘটে পাওনাদারের। রসিক তাকে পরে আসতে বললেও পাওনাদার (মদবিক্রেতা) তাতে কর্ণপাত না করে রসিককে অনেক কটুবাক্য শুনিয়ে যায়। হতাশ গোপাল ও তার সঙ্গীরা ঠিক করলো দাগুরাম সরকারের বাড়ি যাবে। সেখানে তাদের 'মেয়ের জামাতা দেখাতে নিয়ে আসবে' ঘটক। কিছু আমোদ-আহ্লাদও করা যাবে এবং খাওয়া যাবে 'মণ্ডা-মিঠাই'। তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল দাগুরাম সরকারের বাড়ির বাহির-আঙিনা। বর-পাত্র নিয়ে ঘটক চূড়ামণির প্রবেশ। এ-অঙ্কে চরিত্রসংখ্যা সাত। দাগুরামের বাড়িতে সবাই একত্র হয়েছে। গোপাল বরকে (তার নাম বিদ্যাধর দে) নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে কিন্ত ভাবি বরপাত্রটি কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করতে সক্ষম হয় না, যদিও সে পড়ে 'দ্বিতীয় ক্লাশে' এবং তার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে 'ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব, গণিত বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ'। হতাশ দাগুরাম সরকার বিফলমনোরথ হয়ে ঘটক ও বরকে বিদায় করে দেয় এবং গান করতে থাকে :

দোয়াত নাই, কলম নাই, কলম চাঁদ সরকার,
লেখা জানে না, পড়া জানে না, বিদ্যাধর নাম তার
জাগা নাই, জমিন নাই; গল্প করে ভারি।
আগে পাছে লণ্ঠন, টাকার নামে ঠন্ ঠন্,
সদাই দৌড়ান্ গাড়ি ॥
কানে কলম গুজে ফিরে, ছেঁরা কাঁথা গায় ওরে
বাত্তি জ্বালায় লেম্প্ ইংরেজী বকেন্ সদা,
ডেম্ ডেম্ মা ডেম্ ডেম্। (তৃতীয়াঙ্ক, পৃ. ১৯)

প্রথম প্রহসন হিসেবে হরিহর নন্দীর এ-রচনা খানিকটা দুর্বল গোছের। এর শিরোনাম থেকেই এটির বিষয়বস্তু অনুমেয়। একটি বিশিষ্ট লোকোপ্রচলিত প্রবাদকে সার্থকভাবে শিরোনামে ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে-নামকরণ আরম্ভেই সংবাদ দেয় অভ্যন্তরের। মিথ্যে বড়াই প্রদর্শন কিংবা অহৈতুকী অহংকারের অন্তঃসারশূন্যতাকে ব্যঙ্গ করাটাই প্রহসন-রচয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্য। হরিহর নন্দীর প্রথম নাটক এবং পরবর্তী নাটক ও প্রহসনগুলোতেও দেখা যায়, সমাজসচেতনতা তাঁর নাট্যদৃষ্টির একটি বিশেষ গুণ। সমাজস্থিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নানা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে ব্যঙ্গ করা বা খোঁচা দেওয়াটা তাঁর স্বভাবজাত। বর্তমান প্রহসনটির দুটো দিক রয়েছে, প্রথমত গোপাল এবং রসিকের বাবুগিরির অসারতা এবং দ্বিতীয়ত ভাবি-বর বিদ্যাধরের বিদ্যার অসারতা। লক্ষণীয়, বিদ্যাধর নামটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ব্যাজস্তুতি। রচয়িতা নিজেও শিক্ষিত, তাঁর নাটকে-প্রহসনে ইংরেজি শব্দের সাবলীল ও সুপ্রযুক্তি লক্ষ করা যায়। কিন্তু শিক্ষার নামে যাঁরা অকারণ দম্ভপ্রদর্শনকারী, হরিহর নন্দী সেই শ্রেণির লোকদেরই ব্যঙ্গ করেছেন প্রহসনে। প্রথম প্রহসনের হাস্যব্যঙ্গ তাঁর পরবর্তী প্রহসনগুলোতে হয়ে উঠবে তীক্ষ্ণতর। তাঁর প্রহসনের বিষয়বস্তুর দিগন্তও হবে আরও প্রসারিত।

হঠাৎবাবু হরিহর নন্দী রচিত দ্বিতীয় প্রহসন। প্রচ্ছদে মুদ্রিত তথ্য ও বক্তব্যের উদ্ধৃতি :

> প্রহসন। "ফলেন পরিচীয়তে।" শাক্তাগ্রাম নিবাসী শ্রী হরিহর নন্দী প্রণীত। শ্রী রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত। "ভাবিয়া করিও কার্য্য, করিয়া ভাবিও না।" ঢাকা– গিরিশযন্ত্র। মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত! ইং ১৮৭৮। ২৩ শা জুলাই। মূল্য দশ আনা মাত্র।

শেষ প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে নাট্যকারের অন্যান্য নাটিকার সমূল্য শিরোনাম :

> বিজ্ঞাপন। – নিম্নলিখিত পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ ঢাকাস্থ যাবতীয় পুস্তকালয়ে এবং ঢাকা গিরিশযন্ত্রে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী নাটক। দশ আনা।
ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম, প্রহসন। দশ আনা।
হঠাৎ বাবু, প্রহসন। দশ আনা।
নাতিন জামাই, প্রহসন। দশ আনা।
শ্রী হরিহর নন্দী। ঢাকা গিরিশযন্ত্র।

এটিও তাঁর প্রথম নাটিকার মত ১৪ পৃষ্ঠা সংবলিত এবং সেই সঙ্গে প্রচ্ছদ ও তথ্য-বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্যে বরাদ্দ আরও ৪ পৃষ্ঠা।

পাঁচটি গর্ভাঙ্কবিশিষ্ট প্রহসনটির প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থল 'ঢাকা সদরঘাট, কদমতলা।' তিনটি চরিত্র এ-অঙ্কে – কালী, বিনোদ ও বরদা। প্রথম অঙ্কের সারমর্ম হলো, কালী ও বিনোদ পরামর্শ করলো রাত আটটায় কালীর বাড়িতে ব্রান্ডির আসর বসাবে। বরদাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সে আসরে যোগ দেবে কিনা। উত্তরে সে জানায়, তার জ্যাঠামশায়ের জন্যে রাত্রিতে বাড়ি থেকে বের হওয়া দুষ্কর। তখন কালীনাথ বললো, সে গিয়ে তার জ্যাঠামশায়কে বলে তাকে নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল 'বিনোদ বাবুর বৈঠকখানা'। এ-অঙ্কের চরিত্রগুলো গোরাচাঁদ, বিনোদ, কালীনাথ ও বরদা। বিনোদবাবুর বৈঠকখানার আড্ডায় গোরা বিনোদকে পরামর্শ দেয় – সে যেন কুসংসর্গ ছেড়ে দেয়। প্রতিক্রিয়ায় বিনোদ বিশ্রী ভাষায় গালমন্দ করে গোরাকে। অতঃপর সকলে মিলে মদের আসর বসায়। মদ পান করতে করতে বিনোদ কালীকে জিজ্ঞেস করে সে বিয়ে করেছে কিনা। উত্তরে কালী জানায়, পীতাম্বরের মেয়ে শীতলাকে তার পছন্দ। বিনোদ তখন সমস্যার কথা পাড়ে, শীতলা বিবাহিত। একটু পরে সবাই এক হয়ে বেরিয়ে পড়ে 'শুভ কম্ম' সম্পাদনের জন্যে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল কামিনীর বাড়ি। এতে চরিত্রসংখ্যা তিন– কামিনী, বিনোদ ও গাড়োয়ান। বিনোদ কামিনীকে বললো, তার যা কিছু জমাজমি ছিল সব বিক্রি করে যা অর্থ পেয়েছিল সবই সে গচ্ছিত রেখেছে কামিনীর কাছে। উত্তরে কামিনী বললো, সবই ঠিকঠাক আছে, এখন বিনোদ যেন অবশিষ্ট জিনিসপত্রও এনে রাখে তার বাড়িতে। অতঃপর বিনোদ তার বাড়ি গিয়ে সেখান থেকে তার স্ত্রীর গায়ের কয়েকখানা গহনা বাদে সব জিনিসপত্র দুই গাড়ি ভরে নিয়ে আসে কামিনীর কাছে গচ্ছিত রাখতে। বিনোদ রাতটা কামিনী বাবুর ঘরে কাটাতে চাইলে সে বললো, রাতটা সে নিজের বাড়িতেই কাটাক। মনে মনে কামিনী বিনোদকে 'সাত ঘাটার জল' খাওয়ানোর বুদ্ধি আঁটতে থাকে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল গঙ্গার তীর এবং এতে চরিত্রসংখ্যা দুই – গদাধর ও কালীনাথ। গদাধর ও কালীনাথের পারস্পরিক আলাপ থেকে জানা যায়, অবশেষে বিনোদবাবুর 'বাবুগিরি' 'ফেল' করেছে। গদাধর জানায়, বাজারে বিনোদের দেনা অঢেল, সর্বসাকুল্যে প্রায় দশ হাজার টাকা। স্বয়ং গদাধরও তার কাছে ৩০০ টাকা পাওনাদার। গদাধরের কথা থেকে জানা যায়, সম্প্রতি আরেকজন নব্যবাবুর আবির্ভাব ঘটেছে – তার নাম রামকুমার বাবু। পঞ্চম তথা সর্বশেষ গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল

কামিনীবাবুর বাড়ি। এতে তিনটি মুখ্য চরিত্র– কামিনী, বিনোদ ও জনৈক বাবু। কামিনী তার বন্ধুদের সঙ্গে মদের আড্ডায় বেসামাল। মদ পান করতে করতে গান গাইতে থাকে সে। এমন সময়ে সেখানে আগমন ঘটে বিনোদের। কিন্তু বারংবার দরজায় আঘাত করা সত্ত্বেও কেউ তাকে দরজা খুলে দেয় না। উপরন্তু কামিনী বিনোদকে দ্রুত স্থানত্যাগের নির্দেশ দেয়। মনের দুঃখে বিনোদ প্রবল অনুশোচনায় বিদ্ধ হতে থাকে এবং স্থির করে কামিনী নয়, সে যাবে প্রেমদার কাছে।

হরিহর নন্দীর *হঠাৎবাবু* প্রহসনটি পাঠ করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়বে ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্র রচিত *সধবার একাদশী* প্রহসনটির কথা। বস্তুত উনিশ শতকের বাবু কালচার কেবল যে কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল তা নয় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও সেরকম সামাজিকতার প্রকোপ ঘটেছিল, তার প্রমাণ হরিহর নন্দীর এ-প্রহসন। এতে পানাসক্তির কারণে ব্যক্তিগত অধোগতি ছাড়াও সম্পত্তি-হাতছাড়া হওয়া এবং ঋণগ্রস্ততার চিত্রণ লক্ষণীয়। কামিনী চরিত্রটিতে মহাজনশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব দেখানো হয়েছে, যেসব মহাজন লোকের সম্পত্তি অথবা গহনা বন্ধক রাখতো। যদিও সেসব বন্ধক রাখা হতো পরবর্তী সময়ে ফেরত-দানের অভীপ্সায়; কিন্তু বাস্তবে অনেকের পক্ষেই বন্ধকীকৃত সেসব সম্পদ আর ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হতো না। পূর্বেকার নাটকের মতো হরিহর নন্দীর এ-প্রহসনে দৈনন্দিন জীবনের কথকতা ও বাগ্‌ভঙ্গির চমকপ্রদ ব্যবহার লক্ষ করা যাবে। তাছাড়া চরিত্রসমূহের সংলাপের ভাষায় রয়েছে প্রহসনসুলভ ব্যঙ্গ-কৌতুকের তির্যক-তীক্ষ্ণ ভঙ্গি। প্রয়োজনে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে উইট ও হিউমার। প্রথম অঙ্ক থেকে উদ্ধৃতি– দৃশ্যটি গঙ্গা (এখানে গঙ্গা বলতে বর্তমান বুড়িগঙ্গা নদী) নদীর তীরবর্তী এলাকা সদরঘাটের :

> কালী। আহা! গঙ্গার কি মনোহারিণী শোভাই হয়েছে।
>
> বিনোদ। নেচারের যদি শোভা না থাকবে, তবে কি কৃত্রিম পদার্থ মানব নেত্রে বিউটি দেখবে?
>
> কা। তাও অনেক মহাত্মা দেখে থাকেন।
>
> বি। কিসে?
>
> কা। কেন আপন আপন গৃহিণীর অলঙ্কারে। (প্রথম গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১)

উপর্যুক্ত সংলাপে কালীনাথের সংলাপে 'গৃহিণীর অলঙ্কারে'র প্রসঙ্গ দ্বারা বিনোদের গহনা বন্ধক রেখে প্রাপ্ত অর্থে 'বাবুগিরি' প্রদর্শনের বিষয়টি প্রতীকীভাবে আভাসিত হয়েছে। এরকম প্রতীকী ও মিতবাক সংলাপ সৃষ্টিতে হরিহর নন্দীর কৃতিত্ব যথেষ্টই। দীনবন্ধু মিত্রের নিমচাঁদ চরিত্রের প্রভাব প্রহসনটির সংলাপের ভাষায় প্রত্যক্ষ করা যাবে। কথার মাঝখানে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবার এ-রীতির প্রয়োগ দীনবন্ধুর প্রহসনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃষ্টান্ত :

কা। আচ্ছা কোথায় আড্ডা করা যাবে বল দেখি?

বি। কেন তোমার সেই বাড়ীতে।

কা। আচ্ছা তাই হবে, তুমি কিন্তু ভাই রাত ৮টার মধ্যে ব্রান্ডি আর পট নিয়ে উপস্থিত হইতে চাও।

বি। তা ভাই তুমি বলে কষ্ট পাচ্ছ কেন? ছারটেন্‌লি আই মাস্ট গো। (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১)

আরও একটি উদ্ধৃতি :

বরদা। (আহ্লাদে) গুড্‌নাইট, অদ্যকার মিটিঙে যাবেন কি?

বি। না ভাই সে দিনকার মাইফলটা অদ্য সার্থক করব, তোমার ভাই যেতে হবেই হবে।

ব। না ভাই এতদিনে বাড়ির ওল্‌ডফুল বেটা টের পেয়েছে, এখন আমার বাড়ী হইতে বের হওয়াই দুষ্কর।

কা। ওল্‌ডফুলটা কে?

ব। আমারই জেঠা। (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১)

পরিস্থিতিনির্ভর সংলাপ রচনায় বাস্তবের অনুকরণে দক্ষতার পরিচয় দেন হরিহর নন্দী। সেরকম একটি দৃশ্য যেখানে বিনোদ এবং কালীনাথ কালীনাথের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলাপরত :

বিনোদ। কালী বাবু আপনার বে হয়েছে কি?

কালী। না।

বি। কেন?

কালী। আজ পর্য্যন্ত মনের মত পাত্রি জোটে নাই।

বরদা। কাকেও কি তোমার মনে ধরে না?

কালী। ধরেছে বটে, পাবার যো কি?

বি। কাকে?

কালী। পীতাম্বরের মেয়ে শীতলাকে।

ব। হাঁ হাঁ ছুড়ি বড় সুন্দরীই বটে।

বি। হলে কি হবে, ওর যে বিয়ে হয়েছে। (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ৬)

কামিনী যে মহাজন এবং বৈষয়িক বুদ্ধি ও কুশলতায় তার চরিত্রটি যে অতুলনীয় সেটা স্বল্প পরিসরে বোঝাবার জন্যে রচয়িতা মূল রচনার মধ্যে কামিনীর হিসাবের খাতার পৃষ্ঠার হিসাবটিকেও ব্যবহার করেন। এটি কোনো সাহিত্যবিষয়ক পারদর্শিতার দৃষ্টান্ত না হলেও তা নাট্যিক প্রয়োজনে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া সংযোজনটি প্রহসনে কামিনী চরিত্রের বাস্তবসংলগ্নতাকে প্রকাশ করে। দৃষ্টান্ত :

গদা। আমি কি আর মিথ্যে বল্‌ছি, এই দেখুন হিসাব (খাতা নিয়া পাঠ)।

হি: শ্রীবিনোদচন্দ্র দাস।

সাং ঢাকা

ও-------------বাকী-----------------

১লা বৈশাখ

হস্তে খোদ ব্রান্ডি ৮ বোতল– ১২ টাকা

৮ই রোজ মাহ সফর সিং

চিঠি দ্বারা রোম ৬ বোতল– ৬ টাকা

১০ই রোজ মাং রজনী

ব্রান্ডি ২ বোতল– ৩ টাকা (চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১১)

প্রথম নাটকের মতো এ-প্রহসনটিতেও অন্তিমে একটি 'আরা খেমটা' তালের গানের প্রয়োগ রয়েছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে পূর্ববর্তী নাটকের চরিত্র মাধব মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে যেতে যেতে গান গায়, আর এ-প্রহসনে মহাজন কামিনী তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মাতলামো করবার সময় গান গাইতে থাকে। নাটকের শেষে অনেকটা নীতিধর্ম প্রচারের মতো অনুশোচনাগ্রস্ত বিনোদের সংলাপটি রচিত হয় পাঠককে লক্ষ করে। আর সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে প্রহসনেরও :

> বিনোদ। আমি যথেষ্ট প্রতিফল পাইয়াছি আর আমি এমন কর্ম্ম করব না। হায় কি ছিলাম কি হলেম (পতন ও মুর্চ্ছা (ক্ষণেক পরে উঠিয়া) পাঠক মহাশয়? আপনারা জিনিই আমার মত হউন তিনিই আমার অবস্থা শরণ করিবেন। (পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, পৃ: ১৪)

হরিহর নন্দী রচিত তৃতীয় প্রহসন *নাতিনজামাই*। প্রচ্ছদে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এটি 'শাক্তগ্রাম নিবাসী শ্রী হরিহর নন্দী প্রণীত' এবং 'শ্রী হরিকুমার নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত'। একটি সংস্কৃত উদ্ধৃতি মুদ্রিত হয়েছে প্রচ্ছদে – "জীবদ্ভির্ণব, দৃশ্যতে কিমথবা, কিং বা ন চ শ্রুয়তে"। পূর্বেকার প্রহসনের মত এটিও ঢাকা 'গিরিশযন্ত্রে' ছাপা এবং এর মুদ্রক 'মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার'। প্রকাশকাল 'ইং ১৮৭৮। ৮ আগস্ট।' এর মূল্য দশ আনা। প্রচ্ছদ এবং তথ্যাদির জন্যে বরাদ্দ 8 পৃষ্ঠা বাদ দিলে প্রহসনের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫। শেষ প্রচ্ছদে প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কিত পূর্বোক্ত তথ্য মুদ্রিত এবং হরিহর নন্দীর আরেকখানা প্রহসনের বিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছে যেটির নাম পূর্বে মুদ্রিত হয়নি– *ননদ ভাইবৌর ঝগড়া*।

পাঁচ গর্ভাঙ্কবিশিষ্ট প্রহসনটির প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থল 'নবকুমার বাবুর গৃহ'। এতে চরিত্রসংখ্যা চার– নবকুমার, বরদা, কালীনাথ ও ভগা। নবকুমার এবং বরদার সংলাপে প্রহসনের সূচনা। নবকুমারের প্রশ্নের উত্তরে বরদা জানায়, তাদের স্কুলে বন্ধ শুরু

হলেও সে বাড়ি যাবে না। কারণ বাড়ি গেলে লেখাপড়া হয় না। এন্ট্রান্স পাস না করলে বিয়ে করা যাবে না, তাই বরদার প্রতিজ্ঞা, যে করেই হোক এন্ট্রান্স পাস তাকে করতেই হবে। বরদার বক্তব্য থেকে আরও জানা যায়, বাল্যবিবাহের কারণে আয়ু কমে যায় মানুষের। একসময় কালীনাথ শর্ম্মা এসে নবকুমারকে নিমন্ত্রণ করে যায় একটা অনুষ্ঠানে। ভগা নবকুমারের জন্যে একটা চিঠি বয়ে আনে, কোথাও আড্ডা হবে, তারই নিমন্ত্রণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল কুসুমপুর নামক একটি জায়গা – "এক প্রান্তে বৃক্ষতলা দুইটি লোক দণ্ডায়মান হইয়া"। এতে চরিত্রসংখ্যা ২ – অনামা দুজন লোক। রাতের প্রায় দেড় প্রহরে লোক দুজন ঠিক করলো তারা কারও আতিথ্য নেবে। বিশেষত মেঘ-অন্ধকার রাতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ পেরিয়ে 'নসিগঞ্জ' পৌঁছানো অসম্ভব। তারা বুদ্ধি আঁটে, গোকুল সাহার মেয়ের জামাই সাজবে একজন। যে আসল জামাই সে ১২ বছর ধরে দেশান্তরী। রাতটা কাটিয়ে তারা ভোরের দিকে প্রস্থান করবে। অপরজন সাজবে গোকুল সাহার ভৃত্য। তখন প্রথম ব্যক্তি বললো, শুঁড়ির হাতে খেয়ে সে জাত দেবে কীভাবে। তখন ভৃত্যরূপী লোকটি তাকে পরামর্শ দেয়, যদি মাথায় পাগড়ি বেঁধে নেয় তাহলে বলতে পারবে, মাথা ধরেছে, কিছু খাবে না। কিন্তু এতদিন পরে সাক্ষাৎ, শ্বশুর-শাশুড়িকে নিশ্চয়ই প্রণাম করতে হবে। এখন ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে সে প্রণাম করে। তখন ভৃত্যরূপী লোকটা বললো 'মতলবের জন্যে' অনেক কিছুই করতে হয়। পৈতা কোমরে গুঁজে নিয়ে দুজনেই অগ্রসর হলো। তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল নবীন বাবুর 'পুষ্পোদ্যানের বৈঠকখানা'। এতে মুখ্য চরিত্র তিনটি – নবকুমার, নবীন ও বরদা। 'পীতাম্বর সা'র বাড়ির আঙিনায় জামাই ও অন্য সকলেই উপবিষ্ট। পীতাম্বর, বরদা, নবীন, নবকুমার, বর, ভৃত্য, ভোলা। নবীনবাবু, নবকুমার ও বরদা আলাপ করছিল বৈঠকখানায়। এমন সময় স্ত্রীলোকদের জয়ধ্বনি শুনে তারা পীতাম্বর সার আঙিনায় উপস্থিত হলো। সেখানে নতুন জামাই ও তার ভৃত্যকে দেখতে পায় সকলে। জিজ্ঞাসিত জামাই বলে, সে নানান জায়গায় নানান জেলায় ঘুরেছে। এদিকে জামাইয়ের প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে তুলবার উদ্দেশ্যে তার শ্যালক নবীন পীতাম্বরের কাছে সন্দেশ ও ব্রান্ডির টাকা দাবি করে। সবাই মিলে জামাইকে অন্তঃপুরে নিয়ে চলে জলখাবারের উদ্দেশ্যে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল ক্ষীরোদার শয়নগৃহ। সেখানে পীতাম্বরের মা এবং জামাই উপস্থিত। জামাই (ছদ্মবেশী) পীতাম্বরের মাকে বলে, সে খানিকটা অসুস্থ তাই রাতে আর খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন নেই। গান গাইতে গাইতে ক্ষীরোদা দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাবর্তনকারী জামাইয়ের মনোরঞ্জন করতে থাকে। পঞ্চম তথা সর্বশেষ গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল নসিগঞ্জের বাজার। চরিত্রসংখ্যা দুই – গোলক ও নিমাই। তারা বলাবলি করতে থাকে, পূর্বরাত্রিতে পীতাম্বর সাহার ঘরছাড়া জামাইয়ের নাম করে যারা এসেছিল তারা ভোর রাতে মেয়ের গা থেকে গহনাদি নিয়ে

পালিয়ে গেছে। লোকে তাদের এখন একঘরে করেছে। এটাও জানা গেছে যে, জামাইটি ব্রাহ্মণ ছিল। কারণ, মেয়ে ক্ষীরোদা তার কোমরে পৈতে দেখতে পেয়েছিল।

হরিহর নন্দীর *নাতিনজামাই* প্রহসনটি যথেষ্ট হাস্যব্যঙ্গাত্মক। এটি পাঠ করতে গিয়ে বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়রের নাটকের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। নাট্যকার যে ইংরেজি শিক্ষিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্তত এন্ট্রান্স পাস করে থাকতে পারেন তিনি। কিংবা পাস না করলেও হয়তোবা এন্ট্রান্স পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করেছিলেন। প্রহসনটিতে এন্ট্রান্স পাসের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় সমাজে ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের সামাজিক মানমর্যাদার বিষয়ে নাট্যকার সচেতন। প্রহসনটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চরিত্রের ছদ্মবেশ ধারণের ব্যাপারটি। শেক্সপিয়রের বহু নাটকের কথা বলা যায় যেগুলোয় ছদ্মবেশ-ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমগ্র প্রহসনটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ছদ্মবেশ ধারণ এবং সেটির পরিণতি নাট্যিক বাঁক পরিবর্তনে রেখেছে কার্যকর ভূমিকা। সংলাপে বাংলা-ইংরেজির মিশ্রণের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে কৌতুকাবহ, যেটি হরিহর নন্দীর অন্যান্য প্রহসনের বেলায়ও খাটে। একটি নমুনা লক্ষ করা যাক :

বরদা। (বরের প্রতি) তোমার সঙ্গে ওটি কে?
বর। এটি আমারই ভৃত্য।
নব। জাতে কি?
বর। কুম্‌রি।
নবীন। বেতন কত?
বর। সাড়ে থিরি রুপিস্‌। (সকলের হাস্য।)
নব। তোমার বুঝি কিছু ইংরেজীও অভ্যাস আছে?
বর। আজ্ঞা হাঁ। (তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ৯)

হরিহর নন্দীর নাটক ও প্রহসনে গানের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গানগুলোও তাঁরই রচনা। লক্ষ করার বিষয়, গানগুলো নাটক ও প্রহসনে সুপ্রযুক্ত। তিনি যেমন বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দের মিশ্রণে হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করেন তেমনি পরিস্থিতি অনুযায়ী গানের প্রয়োগে মুন্সিয়ানা প্রদর্শন করেন। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে বহুদিন পর ক্ষীরোদা তার স্বামীকে (ছদ্মবেশী) ফিরে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে নাচগানের যে-দৃশ্যের অবতারণা করে সেটি প্রহসনটির চরিত্রের সঙ্গে মানানসই হয়। 'আরখেম্‌টা' তালের গানটি নাট্যরচয়িতা হরিহর নন্দীর গীতিকার-প্রতিভার একটি চমৎকার নিদর্শন :

আগে যান্তেম যদি নিরবধি কান্দাবে আমায়।
তবে কিরে মন প্রাণ সঁপিতেম তোমায় ।।
ভেবেছিলাম পরশ পাথর, কপাল গুণে শুধু পাথর
বোবার যেমন স্বপ্ন দেখা প্রকাশ করা দায় ।। (চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১৩)

হরিহর নন্দীর চতুর্থ প্রহসন ঘুঘু *দেখেছ ফাঁদ দেখনি*। প্রচ্ছদে একটি সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ : "ন রত্নমন্বিষ্যতে মৃগ্যতেহিতৎ"। মুদ্রক ও প্রকাশক পূর্ববর্তী প্রহসনের অনুরূপ। তবে একটি নতুন পঙ্ক্তির সংযোজন ঘটেছে এটিতে – "পড়ে দেখ মজা পাবে"। এটির প্রকাশকাল 'ইং ১৮৭৯। ২০শে ডিসেম্বর' এবং মূল্য নয় আনা। শেষ প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য :

> আমার রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ঢাকা ইসলামপুর শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র ঘোষের পুস্তকালয়ে, বিক্রমপুর হাসারা প্রকাশকের নিকট, অথবা ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি সন ১২৮৬। ৬ই পৌষ।

একই সঙ্গে হরিহর নন্দীর অন্যান্য প্রহসনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে শেষ প্রচ্ছদে, তবে সংযোজিত হয়েছে আরও দুটি প্রহসনের তথ্য – 'ননদ ভাই বৌ ঝগড়া ঐ যন্ত্রস্থ' এবং 'ঘোড়ার ডিম ঐ ঐ' অর্থাৎ এটিও যন্ত্রস্থ। তবে *ঘোড়ার ডিম* নামক প্রহসনটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বর্তমান, চতুর্থ প্রহসনটির পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রচ্ছদ ও অন্যান্য বিবরণীর জন্যে বরাদ্দ চার পৃষ্ঠা বাদ দিলে ২০।

চারটি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত ঘুঘু *দেখেছ ফাঁদ দেখনি*-র প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থল মহিম বাবুর গৃহ। এতে চরিত্রসংখ্যা চার – মহিম, কাশীনাথ, রজনী বাবু এবং কর্ত্তা বাবু। কাশীনাথ সদ্য বিয়ে করেছে। শ্বশুরবাড়ির সুখের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে বেশ হাসিঠাট্টা এবং গান করতে থাকে। রজনীর মারফত জানা যায়, তাদের বাড়ির 'বুড়ো কর্ত্তা' মারা গেছে, এতে রজনী বেশ খুশি। কারণ, তাকে স্কুলে যেতে হবে না, যা ইচ্ছা তা করা যাবে এবং সে ফলার খেতে পারবে। মহিমের পিতা রজনীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে মহিম সম্পর্কে জানতে চায়। রজনী বললো, বাজারে মহিমের চরিত্র সম্পর্কে যে-রটনা আছে তা সত্য নয়। কিন্তু একটু পরেই রজনী ও অন্য সবাই মিলে ঠিক করলো তারা মদ খেয়ে থেকে যাবে নিত্য-র বাড়িতে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল রজনীদের ভিতরবাড়ি। বিমলার শয়নগৃহে বিমলা ও কামিনী আলাপরত। স্বামীদের আচরণ সম্পর্কে নিজেরই স্বামী কামিনীর নিকটে অভিযোগাত্মক কথা বলে যায় বিমলা। সঙ্গদোষে তার স্বামীটিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাতে তার দুঃখ সীমাহীন। বরং এর চেয়ে বৈধব্যও ভালো – বিমলা বিরহাত্মক গান গেয়ে গেয়ে মনের দুঃখ হালকা করবার চেষ্টা চালায়। কিন্তু গান আর কথার মাঝখানে কামিনীর চোখের সামনে বিমলার পতন ও মূর্ছা ঘটে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল রাজপথ এবং এতে চরিত্রসংখ্যা চার – কাশীনাথ, রজনী, মহিম এবং চন্দ্রনাথ। সবাই মিলে স্থির করলো তারা কামিনীর বাড়ি যাবে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল কামিনীর বাড়ি– 'কামিনী আপন ইয়ারগণ সহিত মদ খাইতেছে ও গান গাইতেছে।' কিন্তু রজনী ও তার বন্ধুরা দরজা ধাক্কালেও কামিনী তাদেরকে দরজা খুলে দেয় না। উল্টো পাহারাদারকে ডেকে তাদের ধরিয়ে দিতে বলে পুলিশের কাছে। চন্দ্রনাথ বললো, সে নিজে তার বাড়ি থেকে মদের আসর বসাবার জন্যে প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র এনে দিয়েছে, এখন সে এমন রহস্যময় আচরণ কেন করছে সেটা তার বোধগম্য নয়। রজনীর মনেও একই প্রশ্ন, কামিনী যদি তাকে এত কাছের মানুষ মনে করে তাহলে তার এমন ব্যবহার কেন। বহু জোরাজুরির পরেও কামিনী তাদের অভ্যর্থনা না জানিয়ে বাড়িতে 'চোর ঢুকেছে' অভিযোগে রাতের অভ্যাগতদের পুলিশের নিকট ধরিয়ে দেয়।

হরিহর নন্দীর ঘুঘু *দেখেছ ফাঁদ দেখনি* প্রহসনটিতে মদপানের কুফলকে দেখানো হলেও সমান্তরালে কামিনী-বিমলার সাংসারিক দিকটিও এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া এ-প্রহসনে বেশকিছু গানের ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় এটিকে মঞ্চায়নের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়েছিল। পূর্বেকার নাটক-প্রহসনের 'আরাখেম্‌টা' বা 'আরখেম্‌টা' ছাড়াও নতুন সুরের গান এতে যুক্ত হয়েছে – রামপ্রসাদী সুর। কিন্তু রামপ্রসাদী সুরকে রচয়িতা মোচড় দিয়ে মাতালের কণ্ঠে গীত গানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এই বিপ্রতীপতা বা ব্যাজস্তুতিমূলক বিন্যাস থেকে হরিহর নন্দীর নাট্যভাবনার পারদর্শিতার ছাপ মেলে। কামিনীর কণ্ঠে রামপ্রসাদী সুরের গান :

> এস এ বোতলে মাগো সুরা দেবী ত্বরা করি।
> সদা তোমার দোকানে সুদ্ধ হৃদি পদ্মে ধ্যান করি ।।
> যদি যেমন অনাহারে ইষ্ট মন্ত্র জপ করে।
> আমি তোমায় সেই প্রকারে দান করি হৃদি ভরি ।।
> বাঁচিনে মা তোমা বিনে সদা রৈ সুরি দোকানে,
> জ্বলরূপিনী হওনা কেনে পান করি অঞ্জলী ভরি। (চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১৭)

কামিনী চরিত্রটি প্রহসনটির মুখ্য চরিত্র। কামিনীর বন্ধুদের দৃষ্টিতে তাঁর আচরণ রহস্যময় হলেও আসলে রচয়িতা তাকে অনেকটা স্বার্থপর ও 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও' নীতির অনুসারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। একদল বন্ধুর কাছ থেকে আসর বসাবার নামে মদ ও সরঞ্জামাদি নিয়ে সে অন্য বন্ধুদের নিয়ে সেসব উজাড় করে দিয়েছে। নিজের প্রতিপত্তি দেখাতে গিয়ে বন্ধুদের নিকটে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়েই সে রহস্যময় আচরণ করেছে রজনী, মহিম, চন্দ্রনাথ ও কাশীনাথের সঙ্গে। ইংরেজিতে যাকে 'সিটকম' বলে হরিহর নন্দীর এ-প্রহসনটি অনেকটা সেরকম। অবশ্য তাঁর অন্যান্য প্রহসনকেও সেভাবেই দেখা চলে। তাছাড়া তাঁর প্রতিটি প্রহসনের শেষে থাকে একটা নাটকীয়তার ধাক্কা যেটি কখনও কখনও মেলোড্রামার মত ঠেকে। তবে, এ-প্রহসনটিতে কামিনী চরিত্রের নেপথ্যে দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী*-র নিমচাঁদ চরিত্রটির অনুপ্রেরণা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কামিনীর মাতলামো, গান, মাঝে-মাঝে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এসব স্মরণ করিয়ে দেয় দীনবন্ধুর নিমচাঁদকেই। এ-

প্রহসনেই প্রথম সংলাপে কাব্যময় পঙ্ক্তির নির্মাণ লক্ষ করা যায়। প্রথম গর্ভাঙ্কে কাশীনাথের কয়েকটি সংলাপ গদ্যের পরিবর্তে প্রান্তমিলযুক্ত কাব্যচরণে নির্মিত। কেবল সরল পয়ারই নয়, ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহারও করা হয়েছে সংলাপ-রচনায়। এতে রচয়িতার বৈচিত্র্যসন্ধানী মন ও 'ক্যারিকেচার'-সৃষ্টির মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট।

হরিহর নন্দীর দ্বিতীয় নাটক *ননদ ভাই বৌর ঝগড়া*। প্রচ্ছদে মূল শিরোনামটিকে বিশেষায়িত করা হয়েছে 'এই এক মজার' শব্দগুলো জুড়ে দিয়ে। চারটি প্রহসনের পর প্রকাশ পায় এটি। নাটক কিংবা প্রহসনের প্রচ্ছদে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার তাঁর একটি বিশেষ প্রবণতা। বর্তমান নাটকেও সেরকম একটি শ্লোক উৎকীর্ণ – 'ন রত্নমন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ'। একই শ্লোক তাঁর পূর্ববর্তী ঘুঘু *দেখেছ ফাঁদ দেখনি* প্রহসনের প্রচ্ছদেও মুদ্রিত হয়। এ-নাটকে আবার নাট্যকারের দুই পঙ্ক্তির স্বরচিত কবিতাও স্থান পেয়েছে – 'স্ত্রীর বশ হয়ে যেই ত্যজে আত্মজন।/ সেই হয় জগতের অপ্রিয় ভাজন।।' পঙ্ক্তিদ্বয় অনেকটা সূত্রধারের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা পালন করে। এতে করে নাটক শুরুর প্রাক্কালে বিষয়বস্তু সম্পর্কে দর্শক/পাঠকের মনে খানিকটা পূর্বধারণা জন্মায়। তাছাড়া হরিহর নন্দীর প্রায় নাটক ও প্রহসনে মুদ্রিত 'পড়ে, দেখ মজা পাবে' পঙ্ক্তি থেকে বোঝা যায়, মঞ্চায়নের চাইতেও এগুলোর পঠনই রচয়িতার অধিকতর কাম্য। বর্তমানে পাঠক যেমন লাইব্রেরি থেকে গল্প-উপন্যাস-কবিতা প্রভৃতি গ্রন্থ কেনেন তেমনি সেকালে পাঠক লাইব্রেরি থেকে এসব ক্ষুদ্র নাটক ও প্রহসন ক্রয় করতেন। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত নাটকটির মূল্য দশ আনা। শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত তথ্যাদিতে লক্ষ করা যাবে নবতর সংযোজন– 'মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকসকল গ্রহণেচ্ছুগণ ঢাকাস্থ সমুদয় পুস্তকালয়ে এবং ঢাকা পাটুয়াটুলী ধাত্রী শ্রীযুক্তা ফুলমণী দাসীর বাসায় ও দোকানে এবং ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে আমার নিকটে তত্ত করিলে পাইতে পারিবেন।' নাটকের শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন থেকে তাঁর আরও দুটি নতুন নাটকের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে – *লোভে পাপ পাপে মৃত্যু* এবং *বিধবা বিবাহ নাটক*। দুটোরই মূল্য দশ আনা ধার্য করা হয়েছে। মূল্য থেকে অনুমেয়, নাটক দুটোর সম্ভাব্য আকৃতি তাঁর অন্যান্য নাটক/প্রহসনের মতোই। হরিহর নন্দীর এ-দুটো নাটকেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। *ননদ ভাই বৌর ঝগড়া* হরিহর নন্দীর সর্বাপেক্ষা ক্ষীণকায় নাটক। এটির পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রচ্ছদ ও বিজ্ঞাপনের চার পৃষ্ঠা বাদ দিলে মাত্র আট। একাঙ্ক নাটকটির রয়েছে মাত্র দুটি গর্ভাঙ্ক।

'প্রথমাঙ্কে'র ঘটনাস্থল বিমলার শয়নগৃহ। বিমলা ও কামিনী উপবিষ্টা। তৃতীয় চরিত্র বিধবা বিমলার ভ্রাতৃবধূ। বিধবা বিমলা মনের দুঃখে তার দাদার স্ত্রী সম্পর্কে প্রতিবেশী কামিনীর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে। সে বিধবা হলে তার বাবা-দাদারা তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে। কন্যাকে বিয়ে দিয়ে পণ হিসেবে যা পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে তার দাদার বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। সেই দাদার স্ত্রী আজ বিমলার জন্যে এক বিরাট কষ্টের কারণ। অভিযোগ উত্থাপন করবার সময় মাঝপথে ভায়ের বৌ এসে বিমলাকে

বকাঝকা করে প্রতিবেশীর নিকট নালিশ জানাবার জন্যে। বিমলাও কম যায় না, সেও পাল্টা জবাব দিতে থাকে। অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত ভ্রাতৃবধূটি ননদ বিমলাকে ঝাড়ু দিয়ে মারতে শুরু করে। 'দ্বিতীয়াঙ্কে'র ঘটনাস্থল শুভঙ্কর দাসের শয়ন-গৃহ। এতে চরিত্র দুটি– শুভঙ্কর ও তার স্ত্রী মেঘমালা। শুভঙ্কর তার স্ত্রীর জন্যে নতুন শাড়ি নিয়ে এলে ক্ষুব্ধ স্ত্রী সেটি ছুঁড়ে মারে। শুভঙ্কর কারণ জানতে চাইলে স্ত্রী তাকে একটা বিহিত করবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করায়। তার একটাই কথা, সংসারের মঙ্গল চাইলে বোনকে আর ঘরে ঠাঁই দেওয়া চলবে না। মেঘমালা জানায়, বিমলা তাকে ঝাড়ু দিয়ে প্রহার করেছে। বৌয়ের কথা বিশ্বাস করে শুভঙ্কর মনস্থির করলো, বিমলাকে আর ঘরে স্থান দেওয়া হবে না। নেপথ্যে বাজতে থাকে গান –

> বিয়ে করে যে হয় স্ত্রীর বশীভূত।
> কলঙ্কের বোঝা সেই বহে অবিরত।।
> অতএব সাবধান হও পাঠকগণ।
> বৃদ্ধকালে শেষ বিয়ে না কর কখন।। (দ্বিতীয়াঙ্ক, পৃ. ৮)

হরিহর নন্দীর বর্তমান নাটকের কয়েকটি চরিত্রের নাম ইতঃপূর্বে তাঁর *কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী* নাটিকায় দেখা গেছে। পারিবারিক আবহে রচিত সেই নাটিকায় সাংসারিক কলহকে কেন্দ্র করে নাট্য-কাহিনির আবর্তন। বর্তমান নাটকটিতেও পারিবারিক আবহই মুখ্য। এক্ষেত্রে সংযোজন ঘটেছে ননদের চরিত্রটির। পূর্বে দেবর এবং বর্তমানে ননদ উভয়ের সঙ্গে সংসারে বাইরে থেকে এসে যুক্ত হওয়া নতুন সদস্য বধূটির দ্বান্দ্বিকতাকে আশ্রয় করে রচিত এসব নাটিকায় নাট্যকারের ভাষা-সংলাপ প্রভৃতি লক্ষ করবার মতো। হরিহর নন্দীর নাটক ও প্রহসনের সংলাপে একেবারে দিনানুদিনের ভাষা ও ভঙ্গিই ব্যবহৃত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে ঢাকার লোকেরা যে-ভাষায় কথা বলতো তাঁর নাটক ও প্রহসনগুলি ঠিক সেই ভাষাটাকেই তুলে এনেছে। সেদিক থেকে এসব নাটকের একটা ঐতিহাসিক-ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যও রয়েছে। এমনকি সমাজভাষাতত্ত্বের নিরিখেও এসব সৃষ্টিকর্মের মূল্য বড়ো কম নয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে বিমলা ও কামিনীর সংলাপে দেড়শো বছর আগেকার বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের একটি বিশেষ পরিস্থিতির চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে–

> বি: অনেক দিনের কথা নয়, এই গত রবিবার, যে দিন ও পাড়ার ভট্টার্য্যিদের বাড়ীর ছেলের অন্নারম্ভ, সেদিন আমি বৌকে বল্লেম, শোন বৌ আজি রবিবার নাটাই বর্ত্ত, তুমি আজুল দুই চাউল পাটায় বেটেখনে কতক চাপ্টী পিঠা চানা ও আমি যেয়ে ধানটী এক আলটা করি তখন বৌ বল্লে আমি তোমার হুকুমের বান্দি নৈ করবার হয় কর না হয়, রেখে দে আমার বাব দাদা কেহ পিঠার জন্য বসে রয় নাই এসে।
>
> কা: বলিস কি? আজই এই কথা?

> 'বি: তারপর আমি বল্লেম, টাকা দিয়ে বান্দি কিনে এনেছি কি বসায়ে খাওয়াবার, কায না করিতে পারিলে বের হয়ে যা, দাদাকে কালই আরেক বে করাব, বুন এই কথা বলা মাত্র তার গর্জনী কে শোনে, আমি অবাক।
>
> কা: তারপর?
>
> বি: দিন খানাও ধুম ধামে গেল রাত্রে দাদার আহারান্তে খাটে শুয়ে আছেন, বৌ কি জানি ফুস২ করে বলতে লাগলেন তা কিছুই শুন্তে পাইলাম না, খানিক পরে দাদা বল্লেন তুমি যা বল তাতেই আমি সহমত আছি কিন্তু আমি একথা বল্লে পরে লোকে যারপর নাই গ্লানি কর্ব্বে, তারপর বৌ বল্লে, দেখ আমি তোমার ভালর জন্যই বলি আজকাল যেরূপ দুর্ভিক্ষের দিন পরেছে, এক জনের খোরাকে আর না হয়ত ৪/৫ টাকা লাগে, তদ্দ্বারা এক খানা অলঙ্কার গড়ায়ে আনলে আপন ঘরে আসে, বুন এরূপ শুনে মনের কি অবস্থা হইল তা অন্তঃর্য্যামী ঈশ্বরই জানে। (প্রথমাঙ্ক, পৃ. ১-২)

উপর্যুক্ত সংলাপে তৎকালীন বাঙালি পরিবারের বাস্তব চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। একই সঙ্গে পরিবারে-সমাজে নারীর নিম্ন-সামাজিক অবস্থানের ছবিটাও স্পষ্ট। নাটিকার দ্বিতীয়াঙ্কে শুভঙ্কর এবং তার স্ত্রী মেঘমালার সংলাপে সেই সময়কার পারিবারিক পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে –

> বৌ। তবে বলি শোন– আমাকে নিয়ে যদি তোমার সংসার করবার ইচ্ছা থাকে, আর সুখে কাল কাটাতে চাও, তবে তোমার এই শূর্পণখা ভগ্নীকে আজই ত্যাগ কর, (দ্বিতীয়াঙ্ক, পৃ. ৬)
>
> শুভ। (স্বগত) উঃ শেষকালে বিয়ে করে কি মাটিই খেয়েছি। বলতে পারি না এই স্ত্রীর জন্য পূর্ব্বে ভাইকে ত্যাগ করেছি, তখন ভগ্নীকেও ত্যাগ কর্ত্তে হলো। পাঠক মহাশয়গণ আপনারা পার্জ্জিমানে কেহই যেন এ অবস্থায় শেষ বিয়ে না করেন। তাহলে আমার মত কলঙ্কের ভার বৈতে হবে। (দ্বিতীয়াঙ্ক, পৃ. ৭)

বিবাহ, দাম্পত্য, সাংসারিক সম্পর্কবৈচিত্র্য – বাঙালি জীবনের এই চিরপরিচিত আবেষ্টনীর নানা দিক বাংলা নাটকের আখ্যানভাগে গুরুত্ব পেয়ে এসেছিল বহুকাল থেকে। সেই রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে শুরু করে মাইকেল, দীনবন্ধু, মশাররফ এরকম আরও অনেক নাট্যকারের নাম করা যায়, যাঁদের নাটক এবং প্রহসন প্রভৃতিকে বাংলার ইতিহাস-বিকাশের ধারাবাহিকতায় মূল্যায়ন করা যায়। তবে যাঁদের নাম করা গেল তাঁদের রচনা মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ায় পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক জীবনের চিত্রের প্রসঙ্গ সমালোচকদের আলোচনায় ততটা আসে না। তাছাড়া, পূর্ববঙ্গের হরিশচন্দ্র মিত্র কিংবা হরিহর নন্দী ও অন্যান্যের রচনাবলির দুষ্প্রাপ্যতাও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এইসব পূর্বসূরির রচনা সংরক্ষণ করে রাখতে পারিনি; কিন্তু সুদূর ইংল্যান্ডের গ্রন্থাগারে থরে-থরে সাজানো রয়েছে বাঙালির সৃজন-মননের অগণন সম্পদ। হরিহর নন্দী তেমন সম্পদশালীদের মধ্যে অন্যতম।

হরিহর নন্দীর পঞ্চম প্রহসন *কলির কুলাঙ্গার*। প্রচ্ছদে মুদ্রিত শ্লোকটি ('ন রত্নমন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ') সংস্কৃত দেবনাগরী লিপিতে উৎকীর্ণ। সেই সঙ্গে তাঁর জন্ম ও বাসস্থান ঢাকার পরিচিতির ওপর খানিকটা জোর দেওয়া হয়েছে। তা এজন্যে যে, আমাদের আবিষ্কৃত নাট্যকর্মগুলোর মধ্যে কালানুক্রমে এটিই তাঁর প্রথম বই যেটি কলকাতা থেকে ছাপা হয়। প্রচ্ছদে মুদ্রিত তথ্য ও বক্তব্যের অনুলিপি :

> ঢাকার অন্তর্গত শাক্তাগ্রাম নিবাসী শ্রী হরিহর নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত। 'ধিক্ ধিক্ ধিক্ তারে ধিক্ শতবার/ জননীর প্রতি প্রীতি ভক্তি নাহি যার।' কলিকাতা ৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, আল্‌বার্ট প্রেসে আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১২৮৭। মূল্য /০ আনা।

শেষ প্রচ্ছদে দেশের একাধিক অঞ্চলে তাঁর নাট্যকর্মগুলোর প্রাপ্তিস্থানের ঘোষণা থেকে সমকালীন পাঠকসমাজে হরিহর নন্দীর নাট্যকর্ম সম্পর্কে চাহিদার বিষয়টি অনুমান করা যায়। তাছাড়া এতকাল তাঁর নাট্যকর্ম ছাপা হতো ঢাকা থেকেই কিন্তু এবারে সেক্ষেত্রেও তাঁর দিগন্ত প্রসারিত হয়। শেষ প্রচ্ছদের বক্তব্য থেকে নাট্যকারের সাহিত্যিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর নিজের একটা আস্থাসূচকতার প্রতিফলন লক্ষণীয় –

> বিজ্ঞাপন। মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ১নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট মিত্র কোম্পানীর দোকানে, কুমিল্লা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ নাথের নিকট, ঢাকাস্থ যাবতীয় পুস্তকালয়ে, এবং ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে আমার নিকট প্রাপ্তব্য। একত্র অধিক পুস্তক ক্রয় করিলে ক্রেতাদিগকে বিশেষরূপে কমিশন দেওয়া হয়।

যে-আটটি নাট্যকর্মের বিজ্ঞাপন শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত, সেগুলোর মধ্যে পূর্বোক্ত *ঘোড়ার ডিম*-এর সন্ধান পাওয়া যায়নি। বর্তমান প্রহসনটি প্রচ্ছদ ও বিজ্ঞাপনের জন্যে বরাদ্দ চার পৃষ্ঠা বাদ দিলে মোট ১৬ পৃষ্ঠার।

তিন অঙ্কে বিন্যস্ত *কলির কুলাঙ্গার* প্রহসনটির প্রথমাঙ্কের ঘটনাস্থল নবকুমার বাবুর বৈঠকখানা। প্রধান দুটি চরিত্র নবকুমার ও রজনী। এছাড়াও রয়েছে আরও চারটি চরিত্র– রামসিংহ, স্বর্ণ খেমটাওয়ালি, ছিটা ও দারোয়ান। নবকুমার এবং রজনী দুজনে মিলে স্থির করলো, তারা একজনের বাড়ি যাবে। কিছুক্ষণ পর সেখানে আগমন ঘটে স্বর্ণ নামের এক খেমটাওয়ালির। নবকুমার মনে-মনে ভাবলো, "বাড়ীতে মাদার, ওয়াইফ্, সিষ্টার প্রভৃতি সকলে আছে – একটুকু টের পেলে পরে বিষম হবে – যা হয় এর বাড়ীতে যেয়ে হবে।" কাজেই খেমটাওয়ালির বাড়ি গিয়ে আনন্দ-ফূর্তি করা যায়। ঘরে অসুস্থ স্ত্রীকে রেখে সসঙ্গী নবকুমার চললো খেমটাগৃহে। দ্বিতীয়াঙ্কের ঘটনাস্থল 'পুষ্কর্ণির তটে কদমতলা', অর্থাৎ পুকুরঘাটে কদমতলায়। এতে মূল চরিত্র দুটি – গঙ্গাধর ও কমল। এছাড়া রয়েছে পার্শ্বচরিত্র ছিটা (ভৃত্য)। গঙ্গাধর নবকুমারদের পরিবারের 'ইষ্টদেবতা ঠাকুর'। তাঁর দুঃখ এজন্যে যে, নবকুমার 'রাঁড়ের বাড়ী' গিয়ে

মদ খেয়ে সব পয়সা নষ্ট করছে। দুঃখকষ্টে পড়ে তিনি যখন নবকুমারের সাহায্য চাইতে এসেছিলেন তখন উত্তর দিয়েছিল নবকুমার, রাঁড়ের বাড়িতে অর্থ দিলে যে ফল হয়, গুরুকে দিলে তা হয় না। বাড়ির ভৃত্যের নিকটে জানা যায়, চারদিন ধরে গৃহস্বামীর কোনো খোঁজ নেই। গঙ্গাধর জানাল, নবকুমারের সন্ধানে সে ভৃত্য ছিটাকে পথ দেখিয়ে দিতে পারে কিন্তু সে যেন একথা কারও নিকটে প্রকাশ না করে। তৃতীয়াঙ্কের ঘটনাস্থল স্বর্ণ খেমটাওয়ালীর বাড়ি। এতে চরিত্রসংখ্যা চার – স্বর্ণ, নবকুমার, রজনী ও গঙ্গাধর। নবকুমার ও রজনী স্বর্ণর বাড়িতে মদ্যপানরত। নবকুমার স্বর্ণকে গান গাইতে বললে সে জানায়, সে অসুস্থ এবং স্বর্ণ নবকুমারকে তার প্রস্তাবের জবাবে পদাঘাত করে। গান ধরে নবকুমার। ঠিক তখন সেখানে আগমন ঘটে গঙ্গাধর ও ভৃত্য ছিটার। রজনী ও নবকুমার জোরপূর্বক মদ খাইয়ে দেয় গঙ্গাধর গোঁসাইকে। টানাটানি করে তারা গঙ্গাধরের পৈতেটাও ছিঁড়ে ফেলে। এ-অবস্থায় কেউ গান গেয়ে ওঠে –

> হায় কি বাবু দুখে মরে যাই,/ এমন কভু আমি হেরি নাই।/ গণ্ডমূর্খের কাণ্ড দেখে জ্বলে মরি মানন্তরে, ব্রাহ্মণের পৈতে ছিঁড়ে,/ এ পাপের আর মুক্তি নাই। (তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১৫-১৬)

পরিসমাপ্তি ঘটে আরেকটি নেপথ্য গানে, যে-গানের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রহসনের নামকরণটি –

> সৎ পথে কিছুমাত্র ব্যয় নাহি হয়।
> অসৎ পথেতে হয় লক্ষ মুদ্রা ক্ষয়।।
> কলকেকে মনে মনে ভাবে অলঙ্কার।
> সর্ব্বলোকে তারে বলে কলির কুলাঙ্গার।। (তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১৬)

হরিহর নন্দীর এ-প্রহসন উনিশ শতকের বাবু-কালচার (তাঁর *হঠাৎবাবু* প্রহসনটিও স্মর্তব্য) এবং এর আনুষঙ্গিক বিবিধ উপসর্গ যেমন, মদ্যপান, বারবণিতাগমন, বিবাহাতিরেক যৌনাচার, খেমটাওয়ালীর নাচ উপভোগ, অপব্যয় এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'কলকে' শব্দের ব্যবহার থেকে মদ্যপানের পাশাপাশি তৎকালে মাদকাসক্তির চিত্রও পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়ভাবনার সমধর্মিতার নিরিখে হরিহর নন্দীর *কলির কুলাঙ্গার* প্রহসনটির পূর্বসূরি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০), প্রসন্নকুমার পালের *বেশ্যাসক্তি নিবর্তন নাটক* (১৮৬১), রাধামাধব হালদারের *বেশ্যাসক্তি বিষম বিপত্তি* (১৮৬৩), রামনারায়ণ তর্করত্নের *যেমন কর্ম তেমনি ফল* (১৮৬৫), দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* (১৮৬৬), তারিণীচরণ দাসের *বেশ্যাবিবরণ* (১৮৬৯) এবং আরও কয়েকটি নাটক ও প্রহসনের নাম করা যায়। সে-সময়কার নাটক ও প্রহসনের বিষয়গত প্রাচুর্যের বিচারে এসব সামাজিক

উপসর্গকে এক অর্থে সামাজিক ব্যাধি বলেই অভিহিত করা যেতে পারে। হরিহর নন্দী তাঁর পূর্বসূরি এবং সমকালীন নাট্যকারদের মত সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ থেকে রচনা করেছেন তাঁর নাটক ও প্রহসন। তাঁর সৃষ্ট নবকুমার চরিত্রের সংলাপ থেকে তখনকার যৌব-মানসের চিত্রটি চমৎকারভাবে ধরা পড়ে। এক ধরনের নৈরাজ্য, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রথাবিরোধিতা এবং আত্ম-অহংবোধে উদ্দীপ্ত এসব চরিত্রকে নাটক-প্রহসনের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে নির্মাণ করে সমকালীন নাট্যকার ও প্রহসনরচয়িতারা চলমান সময়ের ওপরেই প্রক্ষেপণ করেছেন মূল আলোক। ফলে, তাঁদের সৃষ্ট সৃজনশীল সাহিত্যকর্মগুলোকে আজও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে ইতিহাসের সমান্তরালে। হরিহর নন্দীর বর্তমান প্রহসন থেকে এটির নায়ক নবকুমারের সংলাপ লক্ষ করা যাক –

> ন। রজনী বাবু! আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগুলো ভাই বড় আহাম্মক ছিল।
>
> র। কোন্ বিষয়ে?
>
> ন। দেখ, তাহারা পাতরকে দেবতা বলে মান্য করেছে – আর বৈষ্ণব সেবায় ব্রাহ্মণ সেবায় কত যে অর্থ অপব্যয় করেছে, তার আর পরিসীমা নাই আর আমরা মদ্ খাব, রাঁড়ের বাড়ী যাব, আপন আয়েস করব, তাতে সকল বেটাই এসে প্রতিবাদী হয়!
>
> র। নেভার মাইন্ড, আই ডোন্‌ক্যার; ওসব ওল্ডফুলের কথা ক্যার কল্লে কি আর কাজ চলে? ওরা যা বকে বকুক্ তাতে আমাদের ক্ষতি কি? (প্রথমাঙ্ক, পৃ. ২)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে দুই বিপরীত ধারার উপস্থিতি রয়েছে। নবকুমারের স্বেচ্ছাচারী আচরণের বিপরীতেও যে একটি 'প্রতিবাদী' ধারা ছিল সেটাও সত্য, যে-ধারাটির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ নবকুমার স্বয়ং। সমাজে-সংসারে নারীরা কতটা অসহায় অবস্থায় ছিল তার চিত্রও রয়েছে প্রহসনে। স্ত্রীর অসুস্থতার চাইতেও নবকুমারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আমোদ-প্রমোদে পরনারী নিয়ে তার বাইরে রাত কাটানোটা :

> ছিটা। আপনি যান কোথায়? মা ঠাকুরাণীর বেয়ারাম আরও বৃদ্ধি পেয়েছে – তাঁকে সুধু বাড়ী রেখে কোথা যান – ঈশ্বর না করুন রাত্রে যদি কোন বিঘ্ন হয়; তা হলে কি উপায় হবে?
>
> ন। আজ দেখ, ব্রহ্মার বাপ বিষ্ণু এলেও আমাকে রাখ্‌তে পার্ব্বে না – যদি তিনি বেঁচে থাকেন, তবে কাল সাক্ষাৎ হবে। (প্রথমাঙ্ক, পৃ. ৭)

এর চাইতেও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয় নারী। হরিহর নন্দীর প্রহসনটির নায়কের আচরণকে রূঢ়-নির্দয় বলে প্রতিভাত হলেও সেটিকে বাস্তবসম্মত বলেই মনে হয়। হরিহর নন্দী তাঁর নাটকে-প্রহসনে যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। একদিকে তিনি পারিবারিক বৃত্তে নারীদের অন্যায্য আচরণের দিকগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন, আবার, অন্যদিকে নারীর প্রতি পুরুষের অমানবিকতার নানা চিত্রও অঙ্কন করেছেন। সেরকম একটি খণ্ডচিত্র অনুসরণ করা যেতে পারে –

ছিটা। আজ্ঞা আপনি শীঘ্র আসুন, মা ঠাকুরাণীকে বের করেচে।

ন। এখন পর্য্যন্ত – তিনি মরেন নাই –

ছি। আজ্ঞা না – কিন্তু মর্‌বার বড় বাকীও নাই।

ন। তবে যা, মলে পরে আমাকে খবর দিস্ আমি যেয়ে মুখ আলো করে আস্‌ব, আমি এখন যেতে পাচ্চি না। (তৃতীয়াঙ্ক, পৃ. ১২-১৩)

হরিহর নন্দী, হরিশচন্দ্র মিত্র এবং আরও অনেক নাট্যকারের কথা বলা যায় যাঁরা এমন একটা সময়ে তাঁদের সাহিত্যকর্ম দ্বারা সমকালীন জীবনকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছিলেন যখন সেসব বিষয়ে জনগণের মধ্যেই ছিল প্রবল প্রত্যাশা ও চাহিদা। মুনতাসীর মামুন রচিত *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার* নামক পূর্বোক্ত গ্রন্থে ঢাকা নগরীর জনজীবনে রঙ্গমঞ্চকেন্দ্রিক তৎপরতার যথেষ্ট চিত্র মেলে। এমনও জানা যায়, ঢাকার আগে কলকাতায় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হলেও দর্শনীর বিনিময়ে তথা টিকিট কেটে নাটক দেখার ঐতিহ্য ঢাকা-ই প্রথম সৃষ্টি করেছিল। এমনকি তখনকার কলকাতা শহরের বিখ্যাত নট-নটীরা ঢাকায় আসতেন মঞ্চনাটকে অভিনয় করবার জন্যে। এ থেকে ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনে নাটক-প্রহসন প্রভৃতির বিপুল চাহিদার দিকটিই প্রমাণিত হয়। কাজেই নাট্যকার ও প্রহসন-রচয়িতা হরিহর নন্দীর সাহিত্য-রচনার পশ্চাতে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ছাড়াও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিকটিও নিহিত ছিল নিঃসন্দেহে।

নাট্যরচয়িতা হরিহর নন্দীর জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত কোনো তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। তাঁর নাট্যকর্মের বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে অনুমান সংগত, তাঁর সঙ্গে 'ঢাকা গিরিশযন্ত্রের' ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হয়তো তাঁর পূর্বসূরি হরিশচন্দ্র মিত্র যেমন একসময় ঢাকার 'বাঙ্গলা যন্ত্রে'র কম্পোজিটর ছিলেন তেমনি হরিহর নন্দী ছিলেন 'গিরিশযন্ত্রের' কম্পোজিটর। এমনকি হরিশচন্দ্র মিত্র ও হরিহর নন্দীর মধ্যে পরিচয় ও বন্ধুতার সম্পর্ক থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। অথবা হয়তো তাঁদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক সুস্থ সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা; যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন একই অঞ্চলের বাসিন্দা। আপাতত সেটি প্রমাণের জন্যে তেমন কোনো সূত্রের অবলম্বন নেই বলে এটিকে অনুমান-পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। হরিহর নন্দী যে ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন সেটা তাঁর নাটকে-প্রহসনে সুপ্রযুক্ত ইংরেজি শব্দাবলির ব্যবহার থেকে বোঝা যায়। তাছাড়া এটিও ঠিক, কম্পোজিটর পেশার চাকুরির জন্যে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য স্তরের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সেকালে, এবং যা একালের জন্যেও সত্য। কেবল মাত্র পাঁচ বছর সময়সীমার মধ্যে সাতটি নাটিকা ও ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা কম গৌরবের বিষয় নয়। তাছাড়া, আমাদের অনুমান তাঁর বিজ্ঞাপিত এবং হদিসবিহীন আরও তিনটি রচনার সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁর রচনার সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়াবে ১০। এর বাইরেও তাঁর আরও রচনা ছিল কিনা তা জানবার একমাত্র উপায় ও উত্তর হতে পারে তাঁর অনাবিষ্কৃত রচনাবলির সন্ধান ও আবিষ্কার। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে বহু সন্ধান চালিয়ে তাঁর উপর্যুক্ত রচনাসমূহের সন্ধান মিলেছে। হতে পারে

সেসব গ্রন্থাগারের দুর্লভ গ্রন্থ সংরক্ষণ-কক্ষে কিংবা মাইক্রোফিল্মের আর্কাইভে আজও সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম, আমাদেরই অপেক্ষায়। যেসব রচনা গ্রন্থাগারে যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলোর অনুলিপি আনা গেলে সেগুলো হবে আমাদের দেশ ও জাতির জন্যে অমূল্য সম্পদ। কেবল হরিহর নন্দীই নন এমন বহু সাহিত্যিক রয়েছেন যাঁদের রচিত বিভিন্ন ধরনের রচনা আজও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রেখেছে ব্রিটিশরা। হরিহর নন্দী, হরিশচন্দ্র মিত্র এবং এরকম নাম-জানা ও নাম-না-জানা আরও অনেক ব্যক্তিত্বের কথা নিশ্চয়ই রয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়, যাঁরা সেই সময়কার ঢাকার নগর-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের নাটক ও প্রহসনের মাধ্যমে। বহুকাল আগেকার সেসব গ্রন্থ থেকে আমরা পেতে পারি আমাদেরই পূর্বপুরুষদের জীবন, সমাজ ও ভাবনার বিচিত্র নিদর্শনও। প্রায় দেড়শো বছর আগেকার নাট্যকার হরিহর নন্দীর নাট্যকর্মের আবিষ্কার সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের।

টীকা

১ এ-বিষয়ে সৈয়দ আবুল মকসুদের প্রত্যক্ষ মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। হরিশচন্দ্র মিত্রের হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

হরিশচন্দ্রের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণটি ধর্মীয়। তিনি ঢাকার অধিবাসী হয়েও যদি হিন্দু না হয়ে মুসলমান হতেন তা হলে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হলেও পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা তাঁকে অন্তত বিস্মৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতো যেমন তারা রেখেছে পূর্ববাংলার কোনো কোনো মুসলমান কবি-সাহিত্যিককে। তিনি মুসলমান হলে এখানকার মুসলমান গবেষক ও শাসকগণ তাঁর দিকে মাত্রাতিরিক্ত সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, যেভাবে মুন্সী নঈমুদ্দীন, দাদ আলী প্রমুখ অল্প কাজ করে অধিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। (সৈয়দ, ১৯৯০ : ১১-১২)

গ্রন্থপঞ্জি

গোলাম মুরশিদ, ১৯৮৪। *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুনতাসীর মামুন, ১৯৭৯। *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

সুকুমার সেন, ১৪০১। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সৈয়দ আবুল মকসুদ, ১৯৯০। *হরিশচন্দ্র মিত্র : ঢাকার সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের পথিকৃৎ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

আকরগ্রন্থ

হরিহর নন্দী, ১৮৭৬। *কলির বৌ ঘরভাঙ্গনী* (নাটিকা), ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীমুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা

—, ১২৮৩। *ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম* (প্রহসন), শ্রী মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত এবং শ্রী রজনীনাথ চাক্‌লাদার কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা

—, ১৮৭৮। *হঠাৎবাবু* (প্রহসন), মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত এবং শ্রী রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা

—, ১৮৭৮। *নাতিনজামাই* (প্রহসন), মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত এবং শ্রী হরিকুমার নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা

—, ১৮৭৯। *ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি* (প্রহসন), মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত এবং শ্রী রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা

—, ১৮৮০। *ননদ ভাই বৌর ঝগড়া* (নাটিকা), মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত, প্রকাশকের নাম নেই, ঢাকা

—, ১৮৮০। *কলির কুলাঙ্গার* (প্রহসন), ৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, আলবার্ট প্রেসে আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রী হরিহর নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা।